অশনি সংকেত ঃ পল্লীচিত্র

বিভূতিভূষণ পল্লীপ্রাণ সাহিত্যিক। অন্যান্য মহৎ সাহিত্যস্রষ্টার মত মানুষ, প্রকৃতি এবং ঈশ্বর তাঁর সৃষ্টির প্রধান উপাদান। তবে রচনা বিশেষে এর তারতম্য আছে। 'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক'-এ মানুষ এবং প্রকৃতির প্রাধান্য। 'ইছামতী'-তে মনে হয় ঈশ্বর বা আধ্যাত্মিকতা যেন ঐ দুটি উপাদানকেও ছাড়িয়ে যায়। 'অশনি সংকেত'-এ প্রকৃতি অল্পস্বল্প আছে, ঈশ্বর আছেন একেবারে গৌণ হয়ে, আর মানুষই এখানে মুখ্য। তবে এ মানুষ শহরের নয়, পল্লীর মানুষ। এরা কেউ উচ্চশিক্ষিত নয়, অভিজাত নয়, বিখ্যাত নয়;

অখ্যাতির আড়ালে বিত্তহীন ম্লান জীবনযাপন করে যারা, তারাই এ উপন্যাসে ভিড় জমিয়েছে। এরা প্রায়ই অশিক্ষিত এবং সংস্কারাচ্ছন্ন কিন্তু চিত্তের অতুল ঐশ্বর্যে এরা অনেকেই মহত্ত্বের সীমা অতিক্রম করে গেছে। অভাবের তাড়নায় অস্থির হয়ে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও জীবনের শেষ সম্বল মনুষ্যত্বকে এরা রক্ষা করার চেষ্টা করেছে।

মন্বন্তরের অভিশাপে জঠরযন্ত্রণায় জর্জরিত এ উপন্যাসের প্রায় প্রতিটি নারী পুরুষ। কিন্তু অশনি সংকেত-এর আগে পর্যন্ত মানুষ ছিল সুখী ও নিরুদ্বেগ, প্রকৃতি ছিল স্থির, শান্ত, রহস্যময়। উপন্যাসের প্রারম্ভে বিভূতিভূষণ অবশ্য সর্বনাশের ইঙ্গিত দিয়েছেন — 'ও বামুন-দিদি, ওঠো, কুমীর এয়েচে নদীতে।' কিন্তু তত্ত্বদর্শী ব্যতীত এ ইঙ্গিত অজ্ঞাতই থেকে যায় গল্পের চরিত্র এবং সাধারণ পাঠকের কাছে। তাই দরিদ্র ব্রাহ্মণ গঙ্গাচরণ বারবার বাসস্থান পরিবর্তন করতে করতে নতুন গাঁয়ে এসে স্ত্রী-পুত্রদের নিয়ে যে সংসার পেতেছে, অনঙ্গ-বৌ সেই সংসারকে সাজিয়ে গুছিয়ে তোলে। তাদের খড়ের ছাউনি দেওয়া মেটে ঘরের উঠোনের ধারে পেঁপে মানকচুর গাছ লাগায়, কঞ্চি দিয়ে রান্নাঘরের চালে তোলে দিশি কুমড়োর লতা, তারই নীচে শোভা পায় বেগুন আর ঢেঁড়শ গাছ। ছায়া-ভরা বিকেলে মাঠের রাস্তা বেয়ে যেতে যেতে গঙ্গাচরণ কল্পনা করে তার গৃহস্থালির ছবি—যদি কিছু ধানী জমি পাওয়া যায়, তবে ক্ষেত-ভরা ধানে তার সংসার উজ্জ্বল হয়ে উঠবে! ছেলেদের নিয়ে গরুর গাড়িতে চড়ে অনঙ্গ-বৌ তার আগের গ্রাম ভাতছালা যেতে যেতে যখন জোড়া নৌকোয় গাড়িসুদ্ধ নদী পার হচ্ছিল তখন তার বেশ মজা লাগছিল। সে আনন্দে দেখছিল নদীর উঁচু ডাঙায় প্রথম বসন্তে বিস্তর ঘেঁটুফুল ফুটে আছে, বাতাসে ভুর ভুর করছে আমের বউলের মিষ্টি সুবাস। আঁকা-বাঁকা শিমুল গাছে রাঙাফুল ফুটে আছে। ভাতছালায় খুব বড় একটা বিলের কাছে অনঙ্গদের বাড়ি ছিল। এই বিলের নাম পদ্মবিল। অনঙ্গ এসে দেখলো, সেই বাড়ি এখন ভগ্নপ্রায়—চালের খড় উড়ে গেছে, গরু ছাগল দাওয়ায় উঠে মাটি খুঁড়েছে। অনঙ্গ বহুদিন স্বপ্ন দেখেছে, এই পদ্মবিলের খুব কাছে সে একটা ঘর বাঁধবে একেবারে খুব ধারে।

কিন্তু মৃত্যুর আগে মতি-মুচিনী জানিয়ে গেল, অনঙ্গর সাধের পদ্মবিল মানুষ পেটের জ্বালায় গেঁড়ি-গুগলি তুলে তুলে একেবারে তছনছ করে ফেলেছে ; বিলের জল এখন ঘোল-দই। শ্রাবণ মাসের শেষের দিকে অনঙ্গ নিজেও দেখল বেড়ায় বেড়ায় তিৎপল্লার ফুল ফুটেছে। কোঁচ বকের লম্বা সারি নদীর ওপর দিয়ে উড়ে যাচ্ছে এপার থেকে ওপারের দিকে। নদীর ঘাটে জল আনতে গিয়ে সে দেখল, ভূষণ ঘোষের বৌ এক জায়গায় হাবড় কাদার উপর ঝুঁকে পড়ে আঁচল ভরে কাদামাখা গেঁড়ি-গুগলি তুলছে। এইভাবে 'অশনি সংকেত'-এর প্রকৃতি ক্ষুধার্ত অসহায় মানুষের হস্তাবলেপে বিকৃত কদর্য হয়ে গেল।

কিন্তু এই মানুষ স্বভাবে তো এমন ছিল না। এরা অনেকেই সহজ, সরল, পরোপকারী এবং সহৃদয়। ন'ক্রোশ দূরের নতুন গাঁ থেকে অনঙ্গ যখন তার ভাতছালার পুরোনো ঘরে ফিরে এল, তখন তার সঙ্গে দেখা করতে এল মতি-বাগদিনী, মতি-মুচিনী। গোয়ালপাড়া থেকে এল বৌ-ঝিয়ের দল। কেউ ঘটিতে করে নিয়ে এল সেরখানেক দুধ, কেউ নিয়ে এল খানিকটা খেজুরগুড়ের পাটালি, কেউ এক ছড়া মর্তমান কলা। অনেক রাত্রি পর্যন্ত দাওয়ায় বসে তারা গল্প করল। অনঙ্গ-বৌয়ের আনন্দ পুরনো সঙ্গিনীদের দেখে। সে যখন এখানে ছিল, তখন কতদিন খাওয়া জোটেনি। এই মতি-মুচিনী কত পাকা আম কুড়িয়ে

এনে দিয়েচে, লোকের গাছের পাকা কাঁঠাল পর্যন্ত চুরি করে এনে খাইয়েছে। সে কি ভোলা যায়! অনঙ্গ কালীকে বলল—'মনে আছে কালী, সেই একদিন লক্ষ্মীপূজোর রাতের কথা?' কালী ভাই-বৌকে লুকিয়ে নতুন ধানের চিড়ে এনে বামুনের মেয়েকে খাবার জোগাড় করে দিয়েছিল। কিন্তু সে-কি মুখে বলা যায়? প্রতিবেশীর জন্য স্নেহ ও সহানুভূতি উপকারীর প্রতি এই কৃতজ্ঞতা বোধ এবং উপকারীর নিরহঙ্কার সহজ মনের মাধুর্য গ্রাম-বাংলার নারীদের সেদিন চরিত্রের বড় ঐশ্বর্য ছিল।

গ্রামের পুরুষদের মধ্যেও যথেষ্ট সহানুভূতির ভাব লক্ষ করা যায়। গঙ্গাচরণ নতুন গাঁয়ে ঘর বেঁধেছে। সে পাঠশালা খুলে নিজের সংসার চালানোর একটা সুরাহা করতে চায়। এতে গ্রামের মানুষ নিজেদের ছেলে পাঠিয়ে তাকে সাহায্য করেছে। অবশ্য ছেলেরা একটু লেখাপড়া শিখুক—সে ইচ্ছাও তাদের ছিল। কারণ লেখাপড়া তারা না জানলেও লেখাপড়া-জানা মানুষকে তারা সমীহ করত। বিশেষ করে সংস্কৃত বলতে পারলে তো কথাই নেই। ভুল সংস্কৃত বললেও অজ্ঞতার জন্য সে ভুল তারা ধরতে পারতো না। ইংরাজির চলন তখন গ্রাম-বাংলায় বিশেষ হয়নি। বাংলা কথার মধ্যে দু'একটা ইংরাজি শব্দের ব্যবহার চালু হয়েছে।

অজ্ঞতার সঙ্গে গ্রামের মানুষের কিছু কিছু প্রাচীন সংস্কার ছিল। তারা যাগ-যজ্ঞ, শান্তি-স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতিতে বিশ্বাসী ছিল। এই সুযোগে গঙ্গাচরণ নিজের আখের অনেকটাই গুছিয়ে নিয়েছিল। সে গোবধের মহাপাপ নিবারণের জন্য কাউকে স্বস্ত্যয়নের বিধান দিয়েছে এবং সঙ্গে দিয়েছে নিজের সংসারের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের তালিকাসহ দীর্ঘ ফর্দ; কখনও বা সে ভিন্ন গ্রামে 'গাঁ বন্ধ' করতে গেছে ওলাউঠা মহামারীর প্রাদুর্ভাব বন্ধ করতে। সেখানেও দীর্ঘ ফর্দ। যদিও কাকতালীয়ভাবে ঐ সব সমস্যার কিছু কিছু সমাধান হয়েছে, কিন্তু বিভূতিভূষণ মনে হয় ধর্মের ঐ সব আচার-সর্বস্ব কুসংস্কারকে কিছুটা ব্যঙ্গাত্মক দৃষ্টিতেই দেখেছেন। ভড়ং আর ভণ্ডামি তো সত্যিই ধর্ম হতে পারে না।

গ্রামে তখন জাতিবিচার ছিল। শূদ্রের হুঁকোয় ব্রাহ্মণ তামাক খেতেন না। শূদ্ররাও তা সামাজিক নিয়ম বলেই মেনে চলত। ব্রাহ্মণের প্রতি তারা সেবাপরায়ণ ছিল। গ্রামের মানুষ অধিকাংশই ছিল গরিব। অসুখ হলে তারা ভালো চিকিৎসা করতে পারতো না। কেউ কেউ কবিরাজ দেখাতো, কেউ বা 'সারকুমারী মত'-এ বিশ্বাস করতো। সারকুমারী এক রকমের অদ্ভুত প্রণালী। জ্বর যত বেশিই হোক, স্নান-আহারের কোন বাধা থাকতো না। ফলে দু'একজন হয়তো সেরে উঠতো কিন্তু বেশির ভাগ রোগীই মারা যেত। তখন গ্রামের মানুষ প্রায়শই ছিল কূপমণ্ডূক। নিজের গ্রামের সংকীর্ণ গণ্ডীর বাইরে যে বৃহত্তর জগৎ আছে, তার খোঁজ তারা রাখত না। তাই বিশ্বাসমশাইয়ের বাড়িতে যখন যুদ্ধের আলোচনা হচ্ছিল, নবদ্বীপ ঘোষাল বললে—শুনচি নাকি কি একটা পুর জারমান নিয়ে নিয়েছে?

বিশ্বাসমশায় বললে—সিঙ্গাপুর।

নবদ্বীপ বললে—সে কোন্ জেলা? আমাদের এই যশোর, না খুলনে? মামুদপুরের কাছে?

বিশ্বাসমশায় হেসে বললে—যশোরও না, খুলনেও না। সে হল সমুদ্দুরের ধারে। বোধহয় পুরীর কাছে, মেদিনীপুর জিলা। তাই না পণ্ডিতমশাই?

এইসব মিলিয়ে গ্রামের মানুষ খুব না হলেও মোটামুটি সুখে ছিল। কিন্তু মন্বন্তর নিয়ে

এল বজ্রপতনের সম্ভাবনা। নিস্তরঙ্গ গ্রাম্যজীবন তরঙ্গবিক্ষুব্ধ বিপদসঙ্কুল হয়ে উঠলো। সেই বিপদের মধ্যেও আমরা বহু সহৃদয় বিবেকী মানুষের পরিচয় পাই। অন্নাভাবের দুঃখ তাদের যেন নতুন করে গড়ে দিয়ে গেল। তাই ভড়ংসর্বস্ব স্বার্থান্বেষী গঙ্গাচরণ বৃদ্ধ সঙ্গীর প্রতি সহৃদয় হয়ে ওঠে বাজারে পারমিট জোগাড় করতে গিয়ে। ক্ষেত্র কাপালী তার সামান্য সম্বল থেকে খাবার কিনে অভুক্ত সঙ্গীকে খাওয়াতে চায়। মতি-মুচিনী কাপালী-বৌ অনঙ্গকে সঙ্গে নিয়ে বন থেকে মেটে আলু তুলে নিয়ে আসতে প্রাণপাত পরিশ্রম করে। অনঙ্গ পারে না, এরা তাকে সাহায্য করে। নিজের দেহ বিক্রির বিনিময়ে সামান্য যে ক'টি চাল কাপালী-বৌ পায়, তার থেকে সে অনঙ্গকে কিছু দিয়ে সাহায্য করতে চায় এই দুর্ভিক্ষের বাজারে। মোট কথা, এইসব অতি তুচ্ছ সাধারণ মানুষগুলির মধ্যে আমরা হঠাৎ যেন দেবত্বকে আবিষ্কার করে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে যাই।

এই দেবত্ব আরও সুন্দর ও পবিত্র হয়ে ওঠে উপন্যাসের অন্তিম পর্বে যখন অনঙ্গ-বৌ গঙ্গাচরণ, দুর্গা ভট্চায ও কাপালী-বৌকে নিয়ে অস্পৃশ্য মতি-মুচিনীর শব বয়ে নিয়ে যায় সৎকারের উদ্দেশ্যে। আসলে মানুষের মধ্যেই দেবতা বাস করেন আর মানুষই সেই দেবতাকে জাগিয়ে তোলে। অনঙ্গ এতদিন নিজের ক্ষুধার অন্ন দিয়ে দেবতাজ্ঞানে যে অতিথিসেবা করে এসেছে, সেই দেবতাকে যেন সে আজ প্রত্যক্ষ করল মৃত ভূলুণ্ঠিত মতি-মুচিনীর মধ্যে। তার হৃদয়-ধর্ম, তার অপরিসীম মানবপ্রীতিই তাকে এই প্রজ্ঞাদৃষ্টি দান করেছে। বিভূতিভূষণ 'অশনি-সংকেত' উপন্যাসে দেবতাকে দর্শন করেছেন কোন ধ্যানস্তিমিত প্রকৃতি বা অন্তরীক্ষে নয়, কোন অপার্থিব দেবলোকে নয়—এই ধূলিমলিন মর্ত্যের মানুষের মধ্যে। তাই মানুষ প্রকৃতি ও ঈশ্বর—এই তিন উপাদান মিলেই আলোচ্য উপন্যাসের পল্লীচিত্র পূর্ণতা লাভ করেছে। তবে প্রসঙ্গত বলা যায়, শরৎচন্দ্রের পল্লীসমাজ যেখানে প্রায়ই নিষ্ঠুর, ক্রূর, হিংসা-বিদ্বেষের দ্বারা কলুষিত ও উৎপীড়ক, বিভূতিভূষণ সেখানে এক আশ্চর্য ক্ষমাসুন্দর প্রশান্তি দিয়ে সব কিছুকে স্নিগ্ধ ও শান্তিময় করে তুলেছেন। তবে যুগ-সংকটের আবর্তে তা শেষ পর্যন্ত শ্মশানের শূন্যতা ও হাহাকারে ভরে গেছে।

দুর্গা বাঁড়ুয্যে ও দীনু ভট্‌চায ঃ

'অশনি-সংকেত' উপন্যাসে গঙ্গাচরণ ব্যতীত দুটি হত-দরিদ্র ব্রাহ্মণের চরিত্র আছে—দুর্গা বাঁড়ুয্যে এবং দীনু ভট্‌চায। দুর্গা বাঁড়ুয্যের পদবী নিয়ে বিভূতিভূষণ একটু গোলমাল সৃষ্টি করেছেন। দুর্গা বাঁড়ুয্যের সঙ্গে যখন আমাদের প্রথম পরিচয় হচ্ছে তখন লেখকের কথায়—'গঙ্গাচরণ বললে—মহাশয়ের নাম? —আজ্ঞে দুর্গা বাঁড়ুয্যে।'

আবার উপন্যাসের শেষে দেখি, 'দুর্গা ভট্‌চায বললে—চলো ভায়া, আমরা দুজনে যা হোক করে ওটির ব্যবস্থা করে আসি। এখানে 'বাঁড়ুয্যে' আর 'ভট্‌চায' দুজনে মিলে গোলমাল পাকিয়েছে। তবে গল্প পাঠে বিশেষ কোন বিপত্তি হয়নি। বিভূতিভূষণ অবশ্য দুর্গা বাঁড়ুয্যেকে মাঝে মাঝে দুর্গা পণ্ডিতও বলেছেন। আলোচনার সুবিধের জন্য দুর্গাকে আমরা দুর্গা বাঁড়ুয্যেই বলবো। কারণ আর একজন ভট্টাচার্যবংশীয় দীনু ভট্‌চায যখন গল্পের মধ্যে আছে। দু'ব্যক্তির দুটি ভিন্ন পদবী থাকাই ভাল। এছাড়া দুই ব্রাহ্মণের পোষ্য সংখ্যা নিয়েও কিছুটা অসঙ্গতি আছে বলে মনে হয়। দুর্গা বাঁড়ুয্যে তার পরিবারের আয়তন বোঝাতে গিয়ে প্রথম দিনে গঙ্গাচরণকে বলেছে, একটি মাত্র মেয়ে, তার পরিবার

অর্থাৎ স্ত্রী, তার বিধবা ভগ্নী—মানে তাকে সুদ্ধ নিয়ে মোট চার জন। আর দীনু ভট্চায বলেছে—'চালের দাম হু হু করে বাড়চে। ছিল সাড়ে চার, হল ছ' টাকা। পাঁচ-ছটি পুষ্যি নিয়ে এখন চালাই কি করে বলুন?' আবার উপন্যাসের শেষের দিকে দুর্গা বাঁড়ুয্যের পরিবার যখন দেশত্যাগ করে চলে আসছে, তখন গঙ্গাচরণকে সে বলছে—'বাড়ির সবাই আসচে কিনা। আমার স্ত্রী, মেয়েটা, আর দুটি ছেলে।' উপন্যাসের ঘটনাকাল হিসেব করলে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত এক দেড় বৎসরের ব্যবধান। তার মধ্যে দুর্গা বাঁড়ুয্যের বিধবা ভগ্নী মারা যেতে পারে, কিন্তু দুটি ছেলের আগমন অসম্ভব মনে হয়। তবে যজমান সন্তান জন্মানো অসম্ভব কিছু না। যাইহোক, এ সবই আলোচনার জন্য আলোচনা। উপন্যাসের আসল বক্তব্য এতে ব্যাহত হয়নি।

বিভূতিভূষণ প্রধানত দেখাতে চেয়েছেন গ্রামের জোতজমাহীন পুরোহিত বা শিক্ষাজীবী ব্রাহ্মণদের অধিকাংশের অবস্থা এমনিতেই খুব খারাপ ছিল, তার উপর মন্বন্তরে তারা একেবারে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল।

দীনু ভট্চাযের কথাই প্রথমে ধরা যাক। কামদেবপুরে গাঁ-বন্ধ করে গঙ্গাচরণ গরুর গাড়ি করে যেদিন ফিরছিল, পুরোহিত দীনু ভট্চাযের সঙ্গে সেদিনই প্রথম দেখা। সে পথের ধারে একটা গাছতলায় দাঁড়িয়ে ছিল। খুব কাতর মিনতি করে সে গঙ্গাচরণকে গাড়ি থেকে নেমে তার কথা শোনবার জন্য অনুরোধ জানাল। বললে—'আমায় কিছু দিয়ে যান আজ যা পেলেন।' সে আরও জানাল বুড়ো বয়সে সে ছাড়া তার রোজগার আর করার কেউ নেই। পাঁচ-ছটি পোষ্য নিয়ে সে খুব বিপদে পড়েছে। তার উপর চালের দাম হু হু করে বাড়ছে। গঙ্গাচরণ এর আগেই একজনের কাছে চালের এই দাম বৃদ্ধির কথা শুনেছিল। কিন্তু তখন তেমন বিশ্বাস হয়নি। এখন দীনু ভট্চাযের মুখেও সেই কথা শুনে গঙ্গাচরণ চিন্তিত হয়ে পড়ল। দীনু ভট্চায আরও জানাল, যুদ্ধের জন্যই নাকি এইসব হচ্ছে। গঙ্গাচরণ নিজের ধান্দায় ব্যস্ত থাকে, ওসব চর্চা করার সময় পায় না; তাছাড়া এ গ্রামে খবরের কাগজও আসে না। দীনু ভট্চায অর্থ উপার্জন করতে পারে না, কিন্তু খবর সংগ্রহ করে।

যাইহোক, গাঁ-বন্ধ করে গঙ্গাচরণের প্রাপ্তি ভালই হয়েছিল। সে নিজের পাওনা থেকে কিছু চাল ডাল দীনু ভট্চাযকে দিল। কিন্তু গাওয়া ঘি দিতে চাইলে দীনু ভট্চায নিল না। সে বললে—'বলে ভাত জোটে না, গাওয়া ঘি!' সে দরিদ্র কিন্তু অধিক লোভ তার নেই। সে ভগবানের কাছে গঙ্গাচরণের মঙ্গল কামনা করে বিদায় নিল।

যুবাবয়সী গঙ্গাচরণের তুলনায় দীনু ভট্চায সত্যিই খুব অক্ষম, অসহায়। সে বৃদ্ধ হওয়ায় যজমানের কাছে পুরোহিত হিসেবে তেমন আদর আর পায় না। তাছাড়া গঙ্গাচরণের মত ভড়ং দেখিয়ে সুযোগমত নিজের আখেরও সে গুছিয়ে নিতে পারে না। তাই গঙ্গাচরণের প্রশংসা করে লোকে বলে—'একি তুই যা তা পেলি রে? ওঁর পেটে এলেম কত? যাকে বলে পণ্ডিত। একি তুই বাগান-গাঁর দীনু ভট্চায পেয়েছিস?'

কিন্তু বিভূতিভূষণ দীনু ভট্চাযকে অবহেলা করেন নি। অনঙ্গ-বৌয়ের মত মাতৃমমতা দিয়ে দীনু ভট্চাযের মত দীনহীন মানুষদের জীবনের দুঃখ-গ্লানিকে তিনি মুছিয়ে দিতে চেয়েছেন। গঙ্গাচরণের অনুপস্থিতির সময় তার বাড়িতে এলে অনঙ্গ ক্ষুধার্ত দীনু ভট্চাযকে অত্যন্ত যত্নসহকারে ভোজন করিয়েছে। মোটা আউশ চালের রাঙা ভাত, ঢেঁড়শ ভাজা, বেগুন ও শাকের ডাঁটা চচ্চড়ি খেয়ে দীনুর অপরিমেয় তৃপ্তি। সে বলে, 'মা-লক্ষ্মীর রান্না

যেন অমর্তো।' খাওয়ার পর অনঙ্গ তাকে তামাক সেজে দিয়েছে। কিন্তু অনঙ্গ তার নাতনীর বয়সী হলেও বাড়ির বধূ হয়ে বাইরের কোন অতিথিকে তামাক সেজে দেওয়ায় দীনু ভট্চায কুণ্ঠিত হয়ে পড়েছে। এতে নারীর প্রতি তার সম্ভ্রমবোধ লক্ষণীয়।

গঙ্গাচরণ বাড়ি ফিরলে দীনু ভট্চায তাকে চালের দুর্মূল্যের কথা বলেছে। এবং বলেছে কিভাবে একমুঠো চাল জোগাড় করা যায় সেই পরামর্শ করতেই তার আসা। গঙ্গাচরণ বলেছে তার কিছু করার নেই। তবে গ্রামের বিশ্বাসমশাইয়ের কাছে একবার গিয়ে দেখা যেতে পারে। কিন্তু দীনু ভট্চায কপর্দকহীন; সে চাল কিনবে কী দিয়ে? শেষ পর্যন্ত অনঙ্গ তার হাতের পেটি বন্ধক দিয়ে গঙ্গাচরণকে বলেছে দীনু ভট্চাযের জন্য চালের ব্যবস্থা করে দিতে। নাহলে সে মাথা খুঁড়ে মরার ভয় দেখিয়েছে। গঙ্গাচরণ স্ত্রীর কথা রেখেছে।

পিতার বয়সী বৃদ্ধ দীনু ভট্চার্যের প্রতি অনঙ্গ-র স্নেহমমতার যেন শেষ নেই। ভাত খাওয়ানোর পর সে দীনু ভট্চাযকে খেজুর গুড় দিয়ে পাকা কাঁকুড় খেতে দিল, অপরের বাড়ি থেকে চা এনে চা খাওয়ালো। আর দীনু ভট্চাযকে অনঙ্গ যা খেতে দেয় তাই তার কাছে, 'চমৎকার'! 'অমর্তো'! আসলে এইসব গরিব দুঃখী মানুষ যারা জীবনে ভালো জিনিস অনেক দিন খেতে পায় না, তারা একদিন খাবার পেলে যে কী গোগ্রাসে গেলে, কী আনন্দ করে খায় তা বিভূতিভূষণ এদের মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন। এইসব মানুষগুলির জন্য বিভূতিভূষণের এক ধরনের সহৃদয় অনুকম্পা ছিল। দীনু ভট্চাযের কথাগুলো অত্যন্ত করুণ হয়ে আমাদের কানে বারবার বাজে—'বুড়ো বয়সে খিদের কষ্ট সহ্যি করতে পারিনে আর। ...বুড়ো বয়সে এবারডা না খেয়ে মরতি হবে দেখচি।' মন্বন্তরে সমস্ত অন্নহীন মানুষের কান্না বিভূতিভূষণ যেন এর মধ্যে দিয়েই শুনিয়েছেন।

কুমুরে নাগরখালির দুর্গা বাঁড়ুয্যেকেও আমরা প্রথম থেকে এই অন্নচিন্তাতেই ক্লিষ্ট হতে দেখি। সে অম্বিকাপুরের লোয়ার প্রাইমারি স্কুলের 'সেকেন' পণ্ডিত। কিন্তু স্কুলের মাইনে, গভর্নমেন্টের এড্ ইউনিয়ন বোর্ডের এড্—সব মিলিয়ে যে পৌনে সাত টাকা পায়, তাতে চারজনের সংসার তার ভাল চলে না। চলে না, কারণ গঙ্গাচরণের মত বাস্তববুদ্ধি তার নেই। মাস্টারি করার সঙ্গে লক্ষ্মীপুজো, ষষ্ঠীপুজো প্রভৃতি পাঁচটা পাঁচ রকম করে উপরি আয়ের ধান্দা সে করতে পারে না। অথচ 'একটু ধম্মকথা একটু সৎ আলোচনা বড্ড পছন্দ' তার। তবে সমব্যবসায়ী বলে নিজের দুঃখের কথাটা সে গঙ্গাচরণকে খুলে বলে গেল।

দুর্গা পণ্ডিতের সঙ্গে গঙ্গাচরণের দ্বিতীয়বার দেখা হল পাঠশালা থেকে ফেরার পথে। দেখা হতেই সেই এক কথা—পৌনে সাত টাকা মাইনেতে সংসার একেবারে অচল। চালের দাম চার থেকে হল ছ' টাকা, এখন দশ টাকা। গঙ্গাচরণের বুক ধক্ করে উঠলো। বললে—কোথায় শুনলেন? দুর্গা পণ্ডিত বললে, রাধিকাপুরের বাজারে গেলেই জানা যাবে। আসলে অভাবে পড়ে দুর্গা বাঁড়ুয্যেকে অনেক খোঁজই রাখতে হয়েছে—কেরোসিন বাজারে পাওয়া যাচ্ছে না, দেশলাইও নেই।

এদিকে গঙ্গাচরণের বাড়ি এসে দুর্গা বাঁড়ুয্যে কেবল গল্পই করছে, উঠতে চাইছে না। সন্ধ্যে হয়ে আসছে। শেষ পর্যন্ত গঙ্গাচরণের সমস্ত উৎকণ্ঠার অবসান ঘটিয়ে সে বলেই ফেলল, এবেলা এখানেই সে দুটি খাবে। দীনু ভট্চাযের মত দুর্গা বাঁড়ুয্যের ক্ষেত্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। মুগের ডাল, আলুভাতে, পেঁপের ডালনা, বড়াভাজা দিয়ে দুর্গা

বাঁড়ুয্যে দারুণ খেল। তাতেও হল না। সে চাইল তেঁতুল, গুড় আর কাঁচা লঙ্কা। গঙ্গাচরণ ভাবলো, তার দু'বেলার আহার দুর্গা পণ্ডিত একাই খেল। আর অনঙ্গ তার কাকার বয়সী এই অতিথির পাতে নিজের জন্য রাখা বড়াভাজাগুলো সব এনে ঢেলে দিল। কারণ যে খেতে পারে তাকে খাইয়ে আনন্দ আছে। তবে শুধুমাত্র খাদ্যরসই দুর্গা বাঁড়ুয্যেকে তৃপ্তি দেয়নি; তৃপ্তির মূলে ছিল পরিবেশনকারিণীর পরিবেশন-নৈপুণ্য, তার হৃদয়ের স্নেহরস : অনঙ্গ-বৌ লজ্জা-কুণ্ঠাজড়িত সুঠাম সুগৌর কাঁচের চুড়ি পরা হাতে গোটা দুই কাঁচা লঙ্কা এনে দুর্গা পণ্ডিতের পাতে ফেলে দিতেই দুর্গা পণ্ডিত ওর দিকে মুখ তুলে চেয়ে বললে— 'মা যে আমার লক্ষ্মী পিরতিমে।' এই মাতৃরূপ যুগে যুগে ক্ষুধার্ত পুরুষ-চিত্তকে মুগ্ধ করেছে, পরিতৃপ্ত করেছে। ইছামতীর রূপচাঁদ মুখুজ্যে নালুপালের দেওয়া ব্রাহ্মণভোজনে বসে তিলুর মধ্যে এই রূপকেই দেখেছিলেন। বিভূতিভূষণও প্রেয়সীর মধ্যে এই শ্রেয়সী জননীকেই দেখতে চেয়েছেন বারবার।

দুর্গা পণ্ডিত সেবার যাবার সময়ে অনঙ্গর উদ্দেশে বলে গেল—'যদি কখনো না খেয়ে বিপদে পড়ি, তুমি একটু ঠাঁই দিও অন্নপূর্ণা। বড্ড গরিব আমি।'

অনঙ্গ ছলছল নেত্রে চেয়ে রইল দুর্গা বাঁড়ুয্যের গমনপথের দিকে। ....

কয়েকদিন পরে দুর্গা বাঁড়ুয্যে আবার এল তার ত্রাণকর্ত্রী মায়ের কাছে। এবার তিন দিনের উপবাসী। শুধু সে একা নয়, উপবাস করেছে বাড়ি সুদ্ধ সকলেই। চিনি নেই, কত দিনের পুরোনো চা নুন দিয়ে খেয়ে তার উপবাস ভঙ্গ হল। থেকে গেল সে তিন দিন। বসে না থেকে সে বেড়া বাঁধতে লাগল। বোধহয় বিনা পরিশ্রমে বসে খেতে তার লজ্জা কিংবা কাজ করে নিজের আশ্রয়ের ভিতটা সে পাকা করে নিতে চায়।

অবশ্য পাকাপাকি আশ্রয়ের জন্য দুর্গা পণ্ডিত আরও কয়েকদিন পরে এল। সঙ্গে স্ত্রী, দুটি পুত্র এবং ষোড়শী কন্যা ময়না। কিন্তু যাদের নিজের খাবার সংস্থান নেই, তারা আশ্রিতদের কী খাওয়াবে? তার উপর সদ্যপ্রসূতি অনঙ্গ এখন রুগ্‌ণ, খুবই দুর্বল। অনন্যোপায় হয়ে দুর্গা বাঁড়ুয্যে ভিক্ষে করতে শুরু করল। এতে তার লজ্জা নেই। কারণ ব্রাহ্মণের উপজীবিকা হল ভিক্ষা। এর সঙ্গে সে গঙ্গাচরণকে প্রস্তাব দিল চাষাদের গ্রামে গিয়ে জ্যোতিষচর্চা করতে। কারণ ওদের হাতে পয়সা আছে। কিন্তু গঙ্গাচরণ জানে, ধান চাল না থাকলে টাকা-পয়সায় কিছু হবে না। তাই সে জমি জোগাড় করে লাঙল দিয়ে জমি চাষ করার উপদেশ দিল। পরান্নভোজী ভিক্ষাজীবী হওয়ার থেকে কৃষিজীবী হওয়া ঢের সম্মানের। চাকুরিহীন জোতজমিহীন তথাকথিত ভদ্রলোকদের এবার ভেবে দেখা প্রয়োজন। কৃষি- বিমুখ মানুষরাই এই মন্বন্তরে মার খাচ্ছে বেশি করে। দুর্গা বাঁড়ুয্যে কী ভাবল বোঝা গেল না।

কিন্তু দুর্গা বাঁড়ুয্যের ভাবনার পরিচয় পাওয়া গেল মতি-মুচিনীর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া নিয়ে। অচ্ছ্যুত বলে মতির শব কেউ স্পর্শ করতে চাইল না। গঙ্গাচরণ দুর্গা পণ্ডিত প্রভৃতি উচ্চ জাতের মানুষেরা বিমুখ হয়ে রইল। কিন্তু অনঙ্গ কাপালী-বৌ নারী হয়েও যখন এই সমাজবিরোধী কাজে এগিয়ে গেল, তখন দুর্গা বাঁড়ুয্যে এবং গঙ্গাচরণের শ্রেণী-চেতনার খোলসটা হঠাৎ খুলে গেল। তাদের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল আসল মানুষটা। মানুষের পরিচয় তার জাত দিয়ে নয়, হৃদয়ধর্ম দিয়ে। সেই নবধর্মে উদ্বুদ্ধ হয়ে দুর্গা বাঁড়ুয্যে গঙ্গাচরণের আগে এগিয়ে গেল। এই বিবর্তন-ধারাতেই দুর্গা বাঁড়ুয্যে এ উপন্যাসে একটি জীবন্ত ও সার্থক চরিত্র। দীনু ভট্‌চাযের চেয়ে সে উপন্যাসে বড় কর্তব্য করেছে।